দারিদ্র্য দুরীকরণে ক্ষুদ্রঋণের ভুমিকাঃ নীলফামারী সদর উপজেলার অভিজ্ঞতার আলোকে একটি বিশে-ষণ

মোঃ মাহফুজ আরেফিন চৌধুরী*
মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান

_সারসংক্ষেপ_

বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় দেশ হলেও দারিদ্র্যের জালে আটকা পরে থাকার কারণে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে কার্যকরভাবে এগুতে পারছে না। দারিদ্র্য দূরীকরণ তথা দরিদ্রদের কাছে ব্যাংকিং সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কে হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করে গ্রামীণ ব্যাংক ১৯৮৩ সালে যাত্রা শুরু করে। গ্রামীণ ব্যাংককে অনুসরণ করে বাংলাদেশে বর্তমানে ৭২০ টি এনজিও ছাড়াও প্রচলিত ব্যাংকসমূহ, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রণালয় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের প্রায় ২ কোটি মানুষ এই কার্যক্রমের আওতায় এসেছে। কিন্তু তারপরও আমাদের দারিদ্র্য পরিস্থিতি ও মানব উন্নয়ন সূচকে তেমন কোন পরিবর্তন আসেনি।

তাই বাংলাদেশের পল-ী এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচন ও দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণের ভূমিকা পরীক্ষা করতে নীলফামারী সদর উপজেলায় এই গবেষণাকর্মটি পরিচালনা করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য ১৩৫ জন ক্ষুদ্রঋণগ্রহীতাকে দৈবভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে চরম দারিদ্র্য প্রশমনে ক্ষুদ্রঋণ কিছুটা ভূমিকা রাখলেও সামগ্রিক ভাবে দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণের ভূমিকা নগন্য।

সর্বোপরি ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে পল-ী এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচন ও দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয়েছে। এজন্য ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঋণের কিস্তির সংখ্যা কমিয়ে সুদের হার সহণীয় পর্যায়ে কমিয়ে আনতে হবে। এছারা ঋণ যাতে উপযুক্ত লোকের হাতে পৌছায় ও উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার হয় সেদিকে ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে নজর দিতে হবে।

* পরিচালক, মিলানা ফ্যাশন এবং অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রথম অধ্যায়

১.১ *ভূমিকা*

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বহুবিস্তৃত দারিদ্র্য আর শাসক গোষ্ঠীর নির্লজ্জ দুর্নীতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। বৃহত্তর প্রত্যাশা আর বিশ্বায়নের সর্বশেষ আশির্বাদ নিয়ে বিশ্ব নতুন শতাব্দিতে পা রাখলেও দারিদ্র্যকে সম্পূর্ণরুপে জয় করা সম্ভব হয়নি। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অর্ধেক মানুষ এখনও দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করছে। ওপেক ভুক্ত তেল সমৃদ্ধ দেশগুলো ছাড়াও অনেক উন্নয়নশীল দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় অবিশ্বাস্য ভাবে বৃদ্ধি পেলেও অধিকাংশ সম্পদ গুটিকয়েক পুঁজিপতির হাতে কুক্ষিগত থাকায় দারিদ্র্যের অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা দেশগুলো উন্নয়নের স্বার্থে অনেক দ্বিমূখী ও বহুমূখী সংস্থা যেমন বিশ্বব্যাংক, UNDP, USAID ইত্যাদি থেকে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করেছে। কিন্তু অপর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তিগত দূর্বলতা, বৈদেশিক সাহায্যের বেহিসাবি ব্যবহার, সাহায্যদাতা দেশ বা সংস্থা কর্তৃক আরোপিত বিভিন্ন শর্ত ইত্যাদি কারণে স্বল্পোন্নত দেশগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। ১৯৬০-১৯৮০ সময়কালে FAO ও IFAD এর সহযোগীতায় HYV প্রযুক্তি ব্যবহার করার কারণে অনেক স্বল্পোন্নত দেশ খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হলেও সম্পদের অসম বন্টণের কারণে উৎপাদন বৃদ্ধি জনিত প্রবৃদ্ধিটা সমাজের একটা বড় অংশের কাছে পৌঁছেনি। অধ্যাপক আবুল বারকাত তার "বাংলাদেশে দারিদ্র্য উচ্ছেদ ও দারিদ্র্য হ্রাস- উদ্বেগের বিষয়" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন মাথাপিছু ২১২২ কিলো ক্যালরির নিচে ভোগ দারিদ্র্যের মাপকাঠি কিন্তু বাংলাদেশে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয় তাকে মোট কিলো ক্যালরিতে রুপান্তরিত করে মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু কিলো ক্যালরির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০০০। এই হিসাবে বাংলাদেশে দারিদ্র্য থাকার কথা নয়। কিন্তু সম্পদ বন্টণের বিপুল বৈষম্যের কারণে বাংলাদেশ বহুবিস্তৃত দারিদ্র্যের জালে আটকা পড়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও অসম বন্টণের কারণে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দারিদ্র্যের অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। উপরন্তু ৮০-এর দশকের সময়কালে অনেক দেশেই দারিদ্র্য ও বেকারত্ব পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করে।

ফলে এটা অনেকের কাছেই বোধগোম্য হয় যে কেবলমাত্র উচ্চ প্রবৃদ্ধির হার দারিদ্র্য হ্রাস করতে পারেনা। এর জন্য অবশ্যই কল্যাণ ও সম্পদের পুনবন্টণকে বিবেচনায় রাখতে হবে। অধ্যাপক Dudley Seers এর মতে কোন দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে কিনা তা তিনটি সূচকের উপর নির্ভর করে যথা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং সম্পদ বন্টণের অসমতা। যদি কোন দেশে এই তিনটি সূচক উচ্চ স্তর থেকে নেমে আসে তাহলে আমরা বলতে পারি যে দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে। যদি এদের কোন একটি উচ্চ স্তরেই থেকে যায় তাহলে আমরা তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে পারিনা। দারিদ্র্য বিমোচনের পূর্বের প্রচেষ্টাগুলোর ব্যর্থতার পর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সর্বশেষ বিকল্প হিসাবে সামনে চলে আসে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পর মানবিক সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্য ১৯৭২ সালে বেশ কিছু স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৭৬ সালে এই এনজিওগুলো উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে আর্বিভূত হয় এবং পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ শুরু করে। দারিদ্র্য

বিমোচনে এনজিওগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ও ক্রমবর্ধমান প্রচেষ্টা সরকার প্রত্যক্ষ করে এবং সকল উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে বিশেষ করে দারিদ্র্য বিমোচনে এদেরকে অংশিদার হিসাবে গ্রহণ করে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনুস প্রথম দলভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের ধারণা দেন, ১৯৭৬ সাল নাগাদ যা দারিদ্র্য বিমোচনের একটি গ্রহণযোগ্য মডেল হিসাবে স্বীকৃত হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে জামানত বিহীনভাবে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের জন্য স্বাধীন ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উচ্চাভিলাষী স্বপ্ন নিয়ে ১৯৮৩ সালে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৭২০টি এনজিও গ্রামীণ ব্যাংককে অনুসরণ করে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং প্রায় ২ কোটি মানুষ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় এসেছে (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০৫)। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সহ নারীর ক্ষমতায়নে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

১.২ *গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য*

আলোচ্য গবেষণা কর্মটির মূল লক্ষ্য হলো বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে ও মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের ভূমিকার একটি বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন উপস্থাপন করা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে গবেষণার নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যকে নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

ক) বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণের ভূমিকা মুল্যায়ন;

খ) ঋণ গ্রহণকারী পরিবারগুলোর আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন বিশ্লেষণ।

গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রত্যয়সমুহ ও তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো।

১.৩ *গবেষণায় ব্যবহৃত প্রত্যয়সমুহের সংজ্ঞা*

১.৩.১ *গ্রামীণ ঋণবদ্ধতা*

এটি এমন একটি অবস্থা যখন ব্যক্তি তার আয়ের অতিরিক্ত ব্যয়ের চাহিদা মেটানোর জন্য অন্যের কাছ থেকে ধার নেয়। পল্লীর দরিদ্র পরিবারগুলোর ঋণের অভাব একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

১.৩.২ *ক্ষুদ্রঋণ*

দরিদ্রদের সঞ্চয়ের সুযোগ দেয়া ক্ষুদ্রঋণের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় ১০৭টি দেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে (ইনকিলাব ২৬-০৭-০৫)। বিভিন্ন ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রঋণকে দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে দাবি করলেও তারা এখন পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণের ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারেনি। অর্থনীতিতেও ক্ষুদ্রঋণের কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই।

পিকেএসএফ এর উপ-মহাব্যবস্থাপক মোঃ ফজলুল কাদের তাঁর "ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানঃ দারিদ্র্য বিমোচনে বিকাশমান প্রতিষ্ঠানিক পুঁজি" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন ক্ষুদ্রঋণ হচ্ছে দরিদ্রদের স্বার্থে ব্যাংকিং যা করা হয় কেবলমাত্র দরিদ্রদের জন্য বিনির্মিত কার্যক্রমের মাধ্যমে।

বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণ মানেই আর অতি ছোট আকারের ঋণ নয়। অগ্রসরমান ক্ষুদ্রঋণগ্রহীতারা এখন ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারে। প্রবৃদ্ধি অঞ্চলের আশেপাশে ৩০,০০০-৩৫,০০০ টাকা ক্ষুদ্রঋণ প্রদান এখন স্বাভাবিক বিষয় (কাদের-২০০৬)।

১.৩.৩ *ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান*

এনজিওসহ যেসব আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে দলভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে তাদেরকেই আমরা বর্তমান গবেষণায় ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচনা করবো।

১.৩.৪ *গ্রামীণ অর্থায়ন বাজার*

বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থায়ন বাজার ঋণের দুইটি উৎস নিয়ে গঠিত যথাঃ (ক) প্রাতিষ্ঠানিক উৎসঃ প্রচলিত ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, সমবায়, এনজিও, বিআরডিবি ইত্যাদি (খ) অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎসঃ আত্মীয়, মহাজন, বন্ধু ইত্যাদি। দারিদ্র্য পরিবীক্ষণ জরিপ ২০০৪ অনুসারে বাংলাদেশের ৫২ শতাংশ দরিদ্র মানুষ অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০৫)।

১.৩.৫ *দারিদ্র্য*

সাধারণভাবে দারিদ্র্য বলতে এমন একটি অবস্থাকে বোঝায় যখন মানুষ তার উপার্জন দ্বারা জীবন ধারণের মৌলিক প্রয়োজনগুলো মেটাতে পারে না। বাংলাদেশের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দারিদ্র্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে "দারিদ্র্য বলতে ঐ সকল মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক বঞ্চনাকে বোঝায় যারা নুন্যতম জীবনযাত্রার স্তরের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের মালিকানা বা অধিকার থেকে বঞ্চিত। খাদ্য শক্তি গ্রহণ পদ্ধতিতে দেখা গেছে মাথা গণনা হার অনুসারে জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য প্রবনতা ১৯৯৯ সালের ৪৪.৭ শতাংশ থেকে ২০০৪ সালে তা ৪২.১ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০৫)।

১.৩.৬ *দারিদ্র্য সীমা*

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো মাথাপিছু সর্বনিম্ন পরিমাণ ক্যালরী গ্রহণের ভিত্তিতে দারিদ্র্য সীমা নির্ধারণ করেছে। দারিদ্র্য পরিমাপে জনপ্রতি প্রতিদিন ২১২২ কিলোক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণকে অনপেক্ষ দারিদ্র্য সীমা এবং ১৮০৫ কিলোক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণকে চরম দারিদ্র্য সীমা হিসাবে গণ্য করা হয়।

১.৩.৭ *আয়ের ভিত্তিতে দারিদ্র্য সীমা*

দারিদ্র্য পরিবীক্ষণ জরিপ ২০০৪ অনুসারে খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত ভোগ্য দ্রব্যের চাহিদার ভিত্তিতে শহর অঞ্চলের জন্য জনপ্রতি মাসিক ৯০৫.৯০ টাকা এবং পল্লী অঞ্চলের জন্য মাসিক ৫৯৪.৬০ টাকা ব্যয় ধরে দারিদ্র্য সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০৫)।

১.৩.৮ *মানব উন্নয়ন*

শিক্ষার স্তর, কারিগরীজ্ঞান এবং দক্ষতাবর্ধক ও আয়সৃষ্টিকারী কর্মকান্ডগুলোকে এখানে মানব উন্নয়নের সূচক হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

১.৩.৯ আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের সূচক

আয়, ভূমির মালিকানা, শ্রমশক্তি, গৃহায়ণ, সঞ্চয়, মূলধনী দ্রব্য, গবাদিপশু, মানবসম্পদ, চয়নের স্বাধীনতা ইত্যাদিকে আলোচ্য গবেষণায় পরিবারগুলোর আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের সূচক হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

১.৪ নমুনা নির্বাচন

১.৪.১ গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহের এলাকা নির্বাচন

নীলফামারী সদর উপজেলায় কার্যরত বিভিন্ন ক্ষুদ্রঋণকার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের ঋণগ্রহীতা সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন অত্যন্ত সুক্ষভাবে পর্যবেক্ষণের মূল্যায়ন করে এই গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করা হয়েছে। নীলফামারী সদর উপজেলা উত্তর বাংলার তথাকথিত মঙ্গা (ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক মাসের সময়কার অভাব অনটন) কবলিত এলাকাগুলোর অন্যতম। এখানকার সংখ্যা গরিষ্ঠ ঋণগ্রহীতা দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে এবং প্রায় প্রতিবছর তারা বন্যা ও খরা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাই পল্লীর দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণের ভূমিকা মূল্যায়নের জন্য নীলফামারী সদর উপজেলাকে যথাযথ গবেষণা এলাকা হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

১.৪.২ ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচন

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৭২০টি এনজিও, গ্রমীণ ব্যাংক, বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংকছাড়াও সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের দ্বারা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০৫)। সীমিত সময় ও সম্পদ নিয়ে সব ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এজন্য নীলফামারী সদর উপজেলায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী ৫টি ক্ষুদ্রঋণদানকারী এনজিও যথাঃ গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা ও টিএমএসএস এর ৫টি শাখা থেকে ঋণগ্রহণকারী সদস্যদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

১.৪.৩ উত্তরদাতা নির্বচন

গবেষণা কর্মটিকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য এমনভবে উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে, যাতে পল্লী এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচন ও দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণের ভূমিকা সম্পর্কে পক্ষপাতহীন ফলাফল পাওয়া যায়। ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণকারী ১৩৫ জন ব্যক্তিকে দৈবভাবে নির্বাচন করা হয়েছে যারা অন্তত ৫ বছর ধরে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করছে। এদের মধ্যে ১২৮ জন মহিলা আর বাকি ৭ জন পুরুষ।

১.৫ তথ্যের প্রকৃতি ও উৎস

গবেষণার প্রয়োজনে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যবহৃত তথ্য সমূহের প্রকৃতি ও উৎস নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১.৫.১ প্রাথমিক তথ্য

২০০৬ সনের ১লা মার্চ হতে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত ১৫দিন ধরে গবেষণা এলাকার মাঠ পর্যায় হতে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় লিখিত কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্র নিয়ে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং

পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণা এলাকার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে কমপক্ষে ৫ বছর থেকে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করছে এমন সদস্যদের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করে দৈবভাবে ঋণগ্রহণকারী উত্তরদাতা নির্বাচন করে তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

১.৫.২ *মাধ্যমিক তথ্য*

গবেষণার পরিপূর্ণতার জন্য বর্তমান গবেষণায় প্রাথমিক তথ্যের সাথে কিছু মাধ্যমিক তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। যেসব তথ্য মাধ্যমিক উৎস থেকে নেয়া হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রাণালয় কর্তৃক প্রকাশিত "বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা" শীর্ষক পরিসংখ্যান গ্রন্থের বিভিন্ন সংখ্যা, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত বর্ষগ্রন্থ, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ওয়েব সাইট ইত্যাদি। এ ছাড়াও আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রকাশিত দেশী-বিদেশী বিভিন্ন ধরনের গবেষণা গ্রন্থের সহায়তা নেয়া হয়েছে।

২.১ *বাংলাদেশে ঋণ গ্রহীতাদের ঋণের উৎস*

ঋণের উৎসকে প্রধানত দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় যথা (ক) প্রাতিষ্ঠানিক উৎসঃ ব্যাংক, সমবায়, সরকারী সংস্থা এবং এনজিওসমূহ (খ) অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎসঃ আত্মীয়, মহাজন, বন্ধু ইত্যাদি। শহর ও

সারণী ২.১ : ঋণের প্রধান প্রধান উৎস (%)

ঋণের উৎস	জাতীয়			শহর			পল্লী		
	সকল	দরিদ্র	দরিদ্র নয়	সকল	দরিদ্র	দরিদ্র নয়	সকল	দরিদ্র	দরিদ্র নয়
প্রাতিষ্ঠানিক উৎসঃ									
ব্যাংক	১৩.০	৮.০	১৭.০	১০.০	৫.০	১৫.০	১৪.০	৯.০	১৭.০
গ্রামীণ ব্যাংক	১০.০	১১.০	৯.০	৩.০	৬.০	২.০	১১.০	১২.০	১০.০
সমবায়	১.০	১.০	০.০	১.০	১.০	১.০	০.০	১.০	০.০
এনজিও	২১.০	২৪.০	১৯.০	২৮.০	৩৭.০	২১.০	১৯.০	২১.০	১৮.০
মন্ত্রণালয়	৩.০	৪.০	২.০	২.০	৩.০	২.০	৩.০	৪.০	২.০
অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস	৫২.০	৫২.০	৫৩.০	৫৬.০	৪৮.০	৪৯.০	৫৩.০	৫৩.০	৫৩.০
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

উৎসঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা–২০০৫

পল্লী এলাকার দরিদ্র ও দরিদ্র নয় এমন জনগোষ্ঠী কোন উৎস থেকে কি হারে ঋণ গ্রহণ করে তা সারণী ২.১ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

সারণী ২.১ থেকে আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ ঋণগ্রহণকারী ব্যক্তি অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে। শহরের দরিদ্র-নয় এমন ব্যক্তিরাই অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের ঋণের প্রধান

গ্রাহক। শহরের ঋণগ্রহীতাদের ৫৯% দরিদ্র-নয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের মধ্যে এনজিওগুলোর গ্রাহক সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। মোট ঋণগ্রহীতাদের ২১% এনজিওগুলো থেকে ঋণ নেয়। দরিদ্র ও দরিদ্র-নয় জনগোষ্ঠীর যথাক্রমে ২৪% ও ১৯% এনজিও থেকে ঋণ নেয়। শহরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণের হার সবচেয়ে বেশী। শহরাঞ্চলের দরিদ্র ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে ৩৭% এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণ করে। বাংলাদেশের তফসিলী ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ ঋণের বড় উৎস, তবে এরা দরিদ্র-নয় শ্রেণীর তুলনায় দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের সামান্যই ঋণ সুবিধা প্রদান করতে পেরেছে। দরিদ্র-নয় শ্রেণীর লোকেদের ১৭% ব্যাংকগুলো থেকে ঋণ গ্রহণ করার সুয়োগ পেলেও দরিদ্র শ্রেণীর ঋণগ্রহীতাদের মাত্র ৮% ব্যাংক থেকে ঋণ সুবিধা উপভোগের সুযোগ পায়। গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশের জনগণের জন্য ঋণের বড় যোগানদাতা হিসাবে আবির্ভুত হয়েছে। তবে গ্রামীণ ব্যাংক পল্লী অঞ্চলে যে হারে গ্রাহক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে শহরাঞ্চলে গ্রামীণ ব্যাংকের গ্রাহক সে তুলনায় কম। পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের ১২% গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ নিলেও শহরাঞ্চলে এই হার মাত্র ৬%। শহরাঞ্চলের দরিদ্র নয় শ্রেণীর লোকদের মাত্র ২% গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়। এছাড়াও সমবায়, বিআরডিবি, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকেও শহর ও পল্লী অঞ্চলের কিছু মানুষ ঋণ গ্রহণের সুযোগ পায়।

২.২ *বেসরকারী সংস্থাসমূহ (এনজিও) এবং গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম*

বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের বড় অংশই বিভিন্ন এনজিও ও গ্রামীণ ব্যাংকের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। দারিদ্র্য পরিবীক্ষণ জরিপ ২০০৪ অনুসারে বাংলাদেশে ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে ২৯ শতাংশ বিভিন্ন এনজিও থেকে, আর ১০ শতাংশ গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। দারিদ্র্য বিমোচনে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে এনজিওগুলো সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি এবং তীব্র শীতে দেশের সুবিধা বঞ্চিত মানুষদের পাশে সাহায্যের হাত নিয়ে এনজিওরা এগিয়ে এসেছে। ২০০৪ সনে ১১৩ টি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা(এনজিও) দেশের বন্যা কবলিত ৪৬ টি জেলার ২৯৮ টি উপজেলায় জরুরী ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় মোট ১২,২৩,১৩৩ পরিবারের জন্য ৯১.৪৩ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য এনজিওদের অনুকূলে এনজিও ব্যুরো হতে ছাড় করে নেয়া হয়েছিল।

CDF পরিসংখ্যান অনুযায়ী ডিসেম্বর ২০০৩ পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ৭২০ টি এনজিও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। এসময় পর্যন্ত মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ১.৪৬ কোটি। এর মধ্যে ০.২৫ কোটি পুরুষ আয় ১.২০ কোটি মহিলা। এ সময়ে ক্রমপুঞ্জীভূত মোট ২৬,৯৪,৭২০ কোটি টাকা সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এই ক্ষুদ্রঋণ আদায়ের হার ৯৭.১৭ শতাংশ। মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ১৫৫৬.১০ কোটি টাকা। এই ক্ষুদ্রঋণের ৪১.৭৯ শতাংশ বিনিয়োগ করা হয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়, ১২.৩১ শতাংশ কৃষিতে, ১৭.৬৪ শতাংশ পশুসম্পদ এবং ৭.৩৯ শতাংশ মৎস্য খাতে। বাংলাদেশের নয়টি সংস্থা যথা ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, টিএমএসএস, কারিতাস, আরডিআরএস, ব্যুরো ও শক্তি ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্রঋণের সর্বোচ্চ অংশ বিতরণ করেছে। এসব ঋণের ২৪.৮৪ শতাংশ পল্লীকর্মসহায়ক সংস্থা হতে সংগৃহীত হয়। এছাড়া গ্রামীণ ব্যাংক একক ভাবে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের একটা বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করে।

সারণী ২.২ থেকে দেখা যায় ১৯৯৯-২০০০ সময়কালে গ্রামীণ ব্যাংক ও বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক

বিতরণকৃত মোট ক্ষুদ্রঋণের ৯৩.৪৬ শতাংশ গ্রামীণ ব্যাংক ও প্রধান দশটি এনজিও সরবরাহ করতো। এরমধ্যে গ্রামীণ ব্যাংক এককভাবে মোট ঋণের ৪৩.৪৪ শতাংশ এবং ব্র্যাক ২১.৬২ শতাংশ ঋণ সরবরাহ করতো। গড়ে প্রত্যেক ঋণের আকার ছিল ৩৪৯৪ টাকা। এই কার্যক্রমে উক্ত সময় পর্যন্ত

সারণী ২.২ : ঋণ বিতরণের ভিত্তিতে প্রথম দশটি এনজিও ও গ্রামীণ ব্যাংকের অবস্থান

ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠা কাল	ঋণগ্রহীতার সংখ্যা (হাজারে)	সুদের হার(%)	কর্মচারী সংখ্যা	ঋণবিতরণ (মিলিয়ন টাকা)	মোটের অংশ(%)	আদায়ের হার(%)
ব্র্যাক	১৯৭৪	২৮৪৬	১৫	৮৬৮৬	৭৫১৬	২১.৬২	৯৮.৩৭
আশা	১৯৭১	১১৪১	১৫	৫২২৬	৩৯৫৭	১১.৩৮	৯৯.৯৩
প্রশিকা	১৯৭৬	৯৯৭	২০	১৯২৮	৩৬৩২	১০.৪৫	৯৫.০৫
কারিতাস	১৯৮৩	২৫১	১২	১৬৭১	৪৮০	১.৩৮	৯০.৬৫
স্বনির্ভর বাংলাদেশ	১৯৭৯	৩৭৩	১১	৪৭২	৪৭৩	১.৩৬	৮৪.৭৭
আরডিআরএস	১৯৯১	২৩৭	১৫	১১৫০	৪১৫	১.১৯	৯০.৪৯
টিএমএসএস	১৯৮৮	১৪৬	১০	১১৭৮	৩৯১	১.১২	৯৮.৩২
শক্তি ফাউন্ডেশন	১৯৯২	৫০	১২	২০২	১৯০	০.৫৫	৯৯.৯২
ব্যুরো	১৯৯০	৫৯	১৫	৫১৯	১৭৫	০.৫০	৯৮.০০
বিইইএস	১৯৮৮		১৫	৩০১	১৬৪	০.৪৭	৯৭.০০
মোট	-	-	-	২১৩৩৩	১৭৩৯৩	৫০.০২	৯৫.২৫
অন্য ৫৬২ টি ক্ষুদ্র ঋণদানকারি এনজিও	-	১৩৯৭	১০-৩০	১৪২৭৪	২২৭৩	৬.৫৪	৯৫.৫৭
গ্রামীণ ব্যাংক	১৯৮৩	২৩৭৮	২০	১১০০০	১৫১০৩	৪৩.৪৪	৯১.০০
সর্বমোট	-	৯৯৫২	-	৪৬৬০৭	৩৪৭৬৯	১০০.০০	৯৪.৯০

উৎস:সিডিএফ রিপোর্ট ২০০০

গ্রামীণ ব্যাংক ও এসব ক্ষুদ্রঋণদানকারী এনজিওসমূহ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে মোট ৪৬,৬০৭ জন চাকুরীরত ছিল। বর্তমানে এই সংখ্যা আরো অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

সারণী ২.২ থেকে আমরা দেখতে পাই গ্রামীণ ব্যাংকসহ প্রধান ক্ষুদ্রঋণদানকারী এনজিওগুলোর মধ্যে প্রশিকা ও গ্রামীণ ব্যাংকের সুদের হার সবচাইতে বেশী ২০%। এছাড়া ব্র্যাক, আশা, আডিআরএস, ব্যুরো, বিইইএস ১৫% হারে সুদ আদায় করে। কারিতাস ও শক্তি ফাউন্ডেশন ১২% হারে সুদ আদায় করছে। গ্রামীণ ব্যাংক ও ক্ষুদ্রঋণদানকারী এনজিওগুলোর গ্রাহক শ্রেণীর বড় অংশ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করলেও তাদের কাছ থেকেই উচ্চ হারে সুদ আদায় করা হয়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে কিছু ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান তাদের সার্ভিস চার্জ কমানোর অঙ্গীকার করেছে। আশা ২০০৭ সালের মধ্যে

তার সার্ভিস চার্জ ৫% কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে (কাদের-২০০৬)।

সারণী ২.৩ থেকে আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২০০৩ সাল পর্যন্ত ৬,০৭,৯৪৫.৭ মিলিয়ন টাকা ক্ষুদ্রঋণ হিসাবে বিতরণ করা হয়েছে। ৭২০টি এনজিও মোট ২,৪৯,৪৭২ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করেছে। একক ভাবে গ্রামীণ ব্যাংক সবচাইতে বেশী ১৮,০২০.৩ মিলিয়ন টাকা ক্ষুদ্রঋণ হিসাবে বিতরণ করেছে যা মোট বিতরণকৃত ক্ষুদ্রঋণের ২৯.৮৪%। জাতীয়করণকৃত তফসিলী ব্যাংকসমূহ ও ক্ষুদ্রঋণের অন্যতম বৃহৎ উৎস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ২০০৩ সাল পর্যন্ত জাতীয়করণকৃত তফসিলী ব্যাংকসমূহ ৮,৭৪৮.১ মিলিয়ন টাকা ক্ষুদ্রঋণ হিসাবে বিতরণ করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিআরডিবি ও পিকেএসএফ যথাক্রমে ৫২,৯৬১.২, ২৭,৫৬১.৫, ১৫,০৬৯.৬ মিলিয়ন টাকা ক্ষুদ্রঋণ হিসাবে বিতরণ করেছে। জাতীয়করণকৃত তফসিলী

সারণী ২.৩ : ২০০৩ সাল পর্যন্ড় বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের মোট বিতরণের পরিমাণ, মোটের শতকরা অংশ, সুবিধাভোগীর সংখ্যা, আদায়ের হার, আদায়ের ধরন, সুদের হার

উৎস	মোট বিতরণ (মলিয়ন টাকা)	মোটের অংশ(%)	মোট সক্রিয় সদশ্য (মিলিয়নে)	গড় আদায়ের হার(%)	আদায়ের ধরণ	সুদের হার(%)
৭২০ টি এনজিও	২৬৯৪৭২০	৪৪.৩২	১৪.৬	৯৭.১৭	সাপ্তাহিক কিস্তি	১২-২০
গ্রামীণ ব্যাংক	১৮০২০৯.৩	২৯.৮৪	২.৭৯	৯৯.০০	সাপ্তাহিক কিস্তি	২০
জাতীয়করণকৃত তফসিলী ব্যাংক সমূহ	৮৭৪৮২.১	১৪.৩৯	৫.৪২	৮৩.৯৮	বাৎসরিক/ মাসিক কিস্তি	১৮
মন্তণালয়/বিভাগ সমূহ	৫২৯৬১.২	৮.৭	-	-	সাপ্তাহিক কিস্তি	১০-১৮
বিআরডিবি	২৭৫৬১.৫	৪.৫	-	৯০.০০	সাপ্তাহিক কিস্তি	১৫-২০
পিকেএসএফ	১৫০৬৯.৬	২.৫	৪.৫	৯৮.৪১	সাপ্তাহিক কিস্তি	-
মোট	৬০৭৯৪৫.৭	১০০	-	-	-	-

উৎস:বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০৫

ব্যাংকগুলো ছাড়া অন্যান্য প্রায় সকল ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান সাপ্তাহিক কিস্তির মাধ্যমে ঋণ আদায় করে। ঋণের বিপরীতে ধার্যকৃত সুদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এনজিওসমূহ ১২-২০% হারে সুদ আদায় করে। এছাড়া গ্রামীণ ব্যাংক, জাতীয়করণকৃত তফসিলী ব্যাংকসমূহ, মন্ত্রণালয়সমূহ ও বিআরডিবি যথাক্রমে ২০%, ১৮%, ১০-১৮%, ১৫-২০% হারে সুদ আদায় করে।

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশে-ষণ ও ব্যাখ্যা

৩.১ *নির্বাচিত ঋণগ্রহণকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য*

এই পর্যায়ে আমরা ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যুক্ত হওয়ার পূর্বে এবং জরিপকালীন সময়ে ঋণগ্রহণকারীদের ব্যক্তিগত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করবো। এ ক্ষেত্রে মাঠপর্যায় হতে সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

৩.১.১ *বয়স-লিঙ্গ ভিত্তিতে ঋণগ্রহীতাদের বন্টণ*

শ্রমশক্তি সমীক্ষা ১৯৯৯-২০০০ অনুসারে বাংলাদেশে অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম মানুষের সংখ্যা ৬০,২৯১,০০০ যাদের মধ্যে ৬২.২৭% পুরুষ আর বাকি ৩৭.৮৩% মহিলা (পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ-২০০২)। নিম্নের সারণী ৩.১ হতে দেখা যাচ্ছে আমাদের নমুনা ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে ৯৪.৮১ শতাংশ মহিলা আর মাত্র ৫.১৯ শতাংশ পুরুষ। অর্থ্যাৎ জাতীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মহিলারা যে হারে অংশ গ্রহণ করে তার চেয়ে অনেক বেশী হারে ক্ষুদ্রঋণগ্রহণকারী মহিলারা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে

সারণী ৩.১: বয়স-লিঙ্গ ভিত্তিতে ঋণগ্রহীতাদের বন্টণ

বয়স গ্রুপ	ঋণ গ্রহীতা				মোট	বাংলাদেশ		
	পুরুষ		মহিলা			জনসংখ্যা - ১৯৯৬		
	গণ সংখ্যা	শতকরা	গণ সংখ্যা	শতকরা		পুরুষ(%)	মহিলা (%)	মোট(%)
১৫বছর পর্যন্ত	০	০	০	০	০	৪৫.৬	৪৫.৯	৪৫.৩
১৫-২৫	০	০	১০	৭.৪১	৭.৪১	১৬.০	১৬.৯	১৬.৯
২৫-৩৫	১	০.৭৪	২৪	১৭.৭৮	১৮.৫২	১৪.০	১৫.২	১৪.৬
৩৫-৪৫	৪	২.৯৬	৪৭	৩৪.৮১	৩৭.৭৮	১০.৩	৯.২	৯.৪
৪৫-৫৫	২	১.৪৮	৪৫	৩৩.৩৩	৩৬.৩০	৬.৪	৬.১	৬.২
৫৫-৬৫	০	০	২	১.৪৮	১.৪৮	৪.১	৩.৭	৩.৯
মোট	৭	৫.১৯	১২৮	৯৪.৮১	১০০	৩.৬	৩.০	১০০

উৎস ঃ জরিপ–২০০৬ এবং পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ-২০০২

সারণী ৩.২ : ঋণগ্রহীতাদের পেশাগত বন্টণ

ঋণগ্রহীতাদের পেশা	বর্তমানে		ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের পূর্বে	
	গণসংখ্যা	শতকরা	গণসংখ্যা	শতকরা
কেবল কৃষি	৩	২.২২	৭	৫.১৯
কৃষি ও ব্যবসা	৪	২.৯৬	০	০
কেবল গৃহবধূ	১০৬	৭৮.৫২	১১৭	৮৬.৬৬
গৃহবধূ ও শ্রমিক	৩	২.২২	০	০
গৃহবধূ ও গৃহপরিচারিকা	৩	২.২২	৯	৬.৭
গৃহবধূ ও দর্জি	৩	২.২	১	০.৭৪
গৃহবধূ ও রেশম চাষ	৫	৩.৭০	০	০
হস্ত শিল্প	১	০.৭৪	১	০.৭৪
গৃহবধূ ও সুদের ব্যবসা	১	০.৭৪	০	০
গৃহবধূ ও পৌলট্রি শিল্প	৫	৩.৭০	০	০
মোট	১৩৫	১০০	১৩৫	১০০

উৎস ঃ জরিপ-২০০৬

অংশগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করে। তাই ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের বিস্তৃতির অর্থ আরো বেশী সংখ্যক মহিলাকে উৎপাদশীল কর্মকান্ডে নিয়োজিত করার সুযোগ সৃষ্টি করা। এতে যেমন পল্লীর দরিদ্র মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটার সুযোগ থাকবে, তেমনি দেশের শ্রমবাজারে শ্রমের সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে, পল্লীর দরিদ্র পরিবারগুলোর গড় আয় বাড়বে এবং নির্ভরশীলতার হার কমবে।

৩.১.২. *পেশার ভিত্তিতে ঋণগ্রহীতাদের বিন্যাস*

ক্ষুদ্রঋণের সফল ব্যবহারের জন্য ঋণগ্রহীতাদের কোন না কোন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত থাকা প্রয়োজন। ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে দাবী করা হয় যে ক্ষুদ্রঋণ দরিদ্রদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। তাদের এই দাবীর যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য নিম্নের সারণী ৩.২ এর মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যুক্ত হওয়ার পূর্বে ও জরিপকালীন সময়ে ক্ষুদ্রঋণগ্রহীতাদের পেশা তুলে ধরা হলো।

সারণী ৩.২ থেকে দেখা যাচ্ছে কোন প্রকার অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত ছিলনা ৮৮.৬৬% ঋণগ্রহীতা। বাকি ১৩.৩৪% ঋণগ্রহীতা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত ছিল। জরিপকালীন সময়ে ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের হার সামান্য বৃদ্দি পেয়ে ২১.৪৮% হয়েছে। এই পরিসংখ্যান থেকে বলা যায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ঋণগ্রহীতাদের স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারছে না।

৩.২ *ঋণগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের পরিবার সম্পর্কিত তথ্য*

বাংলাদেশের পল্লী এলাকার দরিদ্র্য পরিবারগুলোর কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলে। এখন আমরা ঋণগ্রহীতা পরিবারগুলোর ঋণ গ্রহণের পূর্বে এবং জরিপ কালীন সময়ে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি পরীক্ষা করব।

৩.২.১ *ঋণগ্রহণকারীদের পরিবারের শিক্ষার স্তর*

পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার একটি অন্যতম নির্দেশক হলো শিক্ষার স্তর। সারণী ৩.৩ এর মাধ্যমে নির্বাচিত ঋণগ্রহণকারীদের পরিবারের শিক্ষার স্তর দেখানো হলো।

সারণী ৩.৩ : ঋণগ্রহণকারীদের পরিবারের শিক্ষার স্তর

পরিবারের শিক্ষিত সদস্য	বর্তমানে		ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের পূর্বে	
সংখ্যা	গণসংখ্যা	শতকরা	গণসংখ্যা	শতকরা
০০	১৮	১৩.৩৩	২৫	১৮.৫২
০১	৪৯	৩৬.৩০	৬৩	৪৬.৫৭
০২	৪৫	৩৩.৩৩	২৯	২১.৪৯
০৩	১৩	৯.৬২	১০	৭.৪০
০৪ বা এর অধিক	১০	৭.৪২	৮	৫.৯২
মোট	১৩৫	১০০	১৩৫	১০০

উৎস ঃ জরিপ-২০০৬

যদিও সারণী ৩.৩ থেকে দেখা যাচ্ছে ঋণগ্রহীতাদের পরিবারের সদস্যদের শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে তবুও একই সময়ে জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষার হার বৃদ্ধির সাথে তুলনা করলে দেখা যাবে ঋণগ্রহীতার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধি যথেষ্ট নয়। কারণ ঋণগ্রহণকারীর পরিবারের সদস্যরা কেবল ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম থেকেই উপকৃত হয়নি সাথে বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, এনজিও ইত্যাদির ঋণ বহির্ভূত কার্যক্রম দ্বারাও তারা শিক্ষার ক্ষেত্রে উপকৃত হয়েছে।

সারণী ৩.৪ : ঋণগ্রহণকারীর পরিবারের কারিগরি জ্ঞানের স্তর

পরিবারের কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন সংখ্যা	ব র্তমানে		ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের পূর্বে	
সদস্য	গণসংখ্যা	শতকরা	গণসংখ্যা	শতকরা
০০	১১৯	৮৮.১৫	১২৮	৯৪.৮১
০১	৩	২.২২	২	১.৪৮
০২	১০	৭.৪২	৪	২.৯৬
০৩ বা এর অধিক	৩	২.২২	১	০.৭৪
মোট	১৩৫	১০০	১৩৫	১০০

উৎস ঃ জরিপ-২০০৬

৩.২.২ *ঋণগ্রহণকারীর পরিবারের কারিগরি জ্ঞানের স্তর*

ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কেবল ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের মধ্যেই তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখেনা, সাথে কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধির বিভিন্ন ট্রেনিংসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। সারণী ৩.৪ এর মাধ্যমে ঋণগ্রহণের পূর্বে ও জরিপকালীন সময়ে নির্বাচিত ঋণগ্রহীতাদের পরিবারের কারিগরি জ্ঞানের স্তর তুলে ধরা হলো।

সারণী ৩.৪ থেকে আমরা দেখতে পাই ঋণ গ্রহণের পর ঋণগ্রহীতা পরিবারের সদস্যদের কারিগরি জ্ঞানের স্তরে সামান্যই পরিবর্তন এসেছে। জরিপকালীন সময়ে ৮৮.১৫% পরিবারে কোন শিক্ষিত সদস্য ছিলনা।

৩.২.৩ *ঋণগ্রহণকারীদের পরিবারের উপার্জনকারী মহিলা ও পুরুষ সদস্য সংখ্যা*

নিম্নে সারণী ৩.৫ এর মাধ্যমে উত্তরদাতাদের পরিবারের উপার্জনকারী মহিলা ও পুরুষ সদস্য সংখ্যা দেখানো হলো।

সারণী ৩.৫ : ঋণগ্রহীতার পরিবারের উপার্জনকারী মহিলা ও পুরুষ সদস্য সংখ্যা

মোট উপার্জনকারী সদস্য সংখ্যা	বর্তমানে				ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের পূর্বে			
	পুরুষ		মহিলা		পুরুষ		মহিলা	
	গণসংখ্যা	শতকরা	গণসংখ্যা	শতকরা	গণসংখ্যা	শতকরা	গণসংখ্যা	শতকরা
০০	১০২	৭৫.০৬	৩	২.২২	১১৭	৮৬.৫৭	১	০.৭৪
০১	২৬	১৯.২৬	৩৪	২৫.১৯	১৪	১০.৩৭	৭৫	৫৫.৫৬
০২	৫	৩.৭০	৭০	৫১.৮৬	৩	২.২২	৫১	৩৭.৭৮
০৩ বা এর অধিক	২	১.৪৮	২৮	২০.৭৪	১	০.৭৪	৮	৫.৯৩
মোট	১৩৫	১০০	১৩৫	১০০	১৩৫	১০০	১৩৫	১০০

উৎস ঃ জরিপ-২০০৬

সারণী ৩.৬ থেকে দেখা যাচ্ছে ঋণগ্রহণের পূর্বে ৮৬.৫৭% উত্তরদাতার পরিবারে কোন উপার্জনকারী নারী সদস্য ছিলনা আর ১০.৩৭% পরিবারে মাত্র ১ জন করে উপার্জনকারী নারী সদস্য ছিল। জরিপকালীন সময়ে দেখা যায় ১৯.২৬% উত্তরদাতার পরিবারে ১ জন করে উপার্জনকারী নারী সদস্য ছিল এছাড়া ২ জন ও ৩ জন করে উপার্জনকারী নারী সদস্য ছিল যথাক্রমে ৩.৭১% ও ১.৪৮% উত্তরদাতার পরিবারে । তবে এই বর্ধিত উপার্জনকারীর সংখ্যা গরিষ্ঠই দিন মজুর। তাই বলা যায় স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ক্ষুদ্রঋণ খুব বেশী সাফল্য দেখাতে পারেনি।

৩.২.৪ *ঋণগ্রহণকারীদের পরিবারের প্রধান ও সম্পূরক পেশা*

ঋণগ্রহীতার পরিবারের আর্থ-সামাজিক সক্ষমতা উপলব্ধি করার জন্য ঋণগ্রহণের পূর্বে ও পরে তাদের পরিবারের প্রধান পেশা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। এছাড়া প্রধান পেশার সাথে সাথে পল্লী এলাকার অনেক দরিদ্র পরিবারের সম্পূরক পেশা থাকে। আমাদের সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে ঋণগ্রহণের পরেও প্রধান পেশার ক্ষেত্রে তেমন একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। জরিপকালীন সময়ে দেখা গেছে পরিবারের প্রধান পেশা কৃষি, দিন মজুর, ব্যবসা, রিক্সা বা ভ্যান চালনা, দর্জি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ছিল যথাক্রমে ৪৫.১৮%, ২৪.৪৯%, ৬.৬৭%, ৮.১৫%, ২.২২%, ২.৯৬%, ২.২২%, ১.৪৮% ও ১.৪৮% উত্তরদাতার পরিবারের। তবে ঋণগ্রহীতাদের পরিবারের প্রধান পেশার ক্ষেত্রে তেমন কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা না গেলেও তাদের সম্পূরক পেশার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবার্তন লক্ষ্য করা গেছে। ঋণগ্রহণের পূর্বে প্রধান পেশার পাশাপাশি কোন না কোন সম্পূরক পেশা ছিল ৫১.১৫% পরিবারের, আর জরিপকালিন সময়ে দেখা যায় ৭৭.৭৮% পরিবারের প্রধান পেশার সাথে সম্পূরক পেশা ছিল। এক্ষেত্রে পরিবর্তনটা ইতিবাচক হলেও যথেষ্ট নয়। এখানে আরেকটি লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো কয়েকজন ক্ষুদ্রঋণগ্রহীতা ঋণের টাকা দিয়ে সুদের ব্যবসা পরিচালনা করছে।

সারণী ৩.৬ : বছরে ঋণগ্রহীতাদের পরিবারের কর্মসময়ের স্থিতিকাল

কাজে ধরন স্থিতি কাল	কৃষি কর্মকান্ড				অ-কৃষি কর্মকান্ড			
	বর্তমানে		ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের পূর্বে		বর্তমানে		ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের পূর্বে	
	গণসংখ্যা	শতকরা	গণসংখ্যা	শতকরা	গণসংখ্যা	শতকরা	গণসংখ্যা	শতকরা
১২ মাস	৭০	৫১.৮৫	৪৫	৩৩.৩৩	১২৮	৯৪.৮২	১০১	৭৪.৮১
১১ মাস	২০	১৪.৮৩	২৮	২০৭৪	৩	২.২২	২৪	১৭.৭৮
১০ মাস	৩০	২২.২২	৪০	২৯.৬২	৪	২.৯৬	৬	৪.৪৪
৯ মাস	৭	৫.১৯	১০	৭.৪১	০	০	৪	২.৯৬
৮ মাস	৮	৫.৯৩	১২	৮.৮৮	০	০	০	০
মোট	১৩৫	১০০	১৩৫	১০০	১৩৫	১০০	১৩৫	১০০

৩.২.৫ বছরে কর্মসংস্থানের স্থিতিকাল

এলাকা ভেদে বছরে কর্মসংস্থানের স্থিতিকাল ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। আমার গবেষণা এলাকাটি মঙ্গা কবলিত উত্তরবাংলার একটি প্রত্যন্ত এলাকা, যেখানে প্রতি বছরই পল্লীর দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের বিশেষ করে কৃষক ও দৈনিক শ্রমিকদের বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় (ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাস) কাজের অভাবে বাধ্য হয়ে অ-নিয়োজিত বা ঊণ-নিয়োজিত অবস্থায় সময় কাটাতে হয়। নিম্নের সারণী ৩.৬ এর মাধ্যমে ঋণ নেওয়ার পূর্বে ও জরিপকালীন সময়ে ঋণগ্রহীতাদের পরিবারের ১ বছরের মধ্যে কর্মসময়ের স্থিতিকাল তুলে ধরা হলো।

সারণী ৩.৬ থেকে দেখা যায় ঋণগ্রহণের পূর্বে মাত্র ৩৩.৩৩% ঋণগ্রহীতা পরিবার সারা বছর কৃষিকর্মকান্ডে কমসংস্থানের সুযোগ পেত। আর বছরে ১১, ১০, ৯ ও ৮ মাস কৃষিকর্মকান্ডে

কর্মসংস্থানের সুযোগ পেত যথাক্রমে ২.৭৫%, ২৯.৬২%, ৭.৪১% ও ৮.৮৯% পরিবার । কিন্তু জরিপকালীন সময়ে দেখা যায় বছরে ১২ মাস, ১১ মাস, ১০ মাস, ৯ মাস ও ৮ মাস কৃষি কর্মকান্ডে নিয়োজিত থাকার সুযোগ পায় যথাক্রমে ৫১.৮৪%, ১৪.৮৩%, ২২.২২%, ৫.১৯% ও ৫.৯৩% ঋণগ্রহীতার পরিবার। বাংলাদেশের কৃষিতে বহুমুখীকরণের যে ধারা শুরু হয়েছে তার সুফল হিসাবে ঋণগ্রহীতাদের পরিবারগুলোর বছরে কর্মসময়ের স্থিতিকাল বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া অ-কৃষি কর্মকান্ডে ঋণগ্রহীতাদের পরিবারের সদস্যরা জরিপকালীন সময়ে পূর্বের চেয়ে বেশী সময় নিয়োজিত থাকার

সারণী ৩.৭ : ঋণগ্রহণকারীদের পরিবারের মোট বাৎসরিক আয়(টাকা)

আয়ের পরিমাণ	বর্তমানে		ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের পূর্বে	
	গণসংখ্যা	শতকরা	গণসংখ্যা	শতকরা
১৫,০০০ পর্যন্ত	১০	৭.৪২	১৯	১৪.০৭
১৫,০০০-২৫,০০০	২৪	১৭.৭৮	২৯	২১.৪৮
২৫,০০০-৩৫,০০০	১৭	১২.৫৯	১১	৮.১৫
৩৫,০০০-৪৫,০০০	৩০	২.২২	৩৫	২৫.৯২
৪৫,০০০-৫৫,০০০	২৫	১৮.৫২	২৯	২১.৪৮
৫৫,০০০-৬৫,০০০	১৬	১১.৮৫	৭	৫.১৯
৬৫,০০০ এর অধিক	১৩	৯.৬৩	৫	৩.৭০
মোট	১৩৫	১০০	১৩৫	১০০

উৎস ঃ জরিপ-২০০৬

সুযোগ পাচ্ছে। ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের পূর্বে ৭৪.৮১% ঋণগ্রহীতার পরিবার বছরে ১২ মাস অ-কৃষি কর্মকান্ডে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেত, জরিপকালীন সময়ে এই সংখ্যাটা ৯৪.৮২% এ বৃদ্ধি পায়। অথ্যাৎ কৃষি এবং অ-কৃষি কর্মকান্ডে ঋণগ্রহীতাদের কর্মসময়ের স্থিতিকাল বৃদ্ধিতে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে।

৩.২.৬ *ঋণগ্রহণকারীদের পরিবারের মোট বাৎসরিক আয়*

নিম্নের সারণী ৩.৭ এর মাধ্যমে ঋণগ্রহণকারীদের পরিবারের মোট বাৎসরিক আয় তুলে ধরা হলো।

সারণী ৩.৭ থেকে দেখা যায় যে, ঋণ গ্রহণের পর পরিবারগুলোর আয় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে একই সময়ে দ্রব্য মূল্য ও জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি বিবেচনায় আনলে আয়ের এই বৃদ্ধি যথেষ্ট নয় বলে বিবেচিত হবে।

৩.৩ *ঋণগ্রহীতাদের পরিবারের সম্পদের ধরন*

নিম্নে ঋণনেয়ার পূর্বে এবং জরিপকালীন সময়ে ঋণগ্রহীতাদের পরিবারের অর্থনৈতিক সামথ্যের চিত্র

তুলে ধরা হলো ।

৩.৩.১ *ঋণগ্রহীতাদের পরিবারের চাষযোগ্য জমির মালিকানার ধরন*

ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে, তারা ভূমিহীন এবং সম্পদহীন, পল্লীর দরিদ্রতম ব্যক্তিদের ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে থাকে । কিন্তু আমাদের সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ঋণ গ্রহণের পূর্বে সেখানে ৫৬.৩৪% ঋণগ্রহীতার পরিবার কার্যত ভূমিহীন ছিল, সেখানে ঋণ গ্রহণের পর ৩.০১% পরিবার নতুন করে ভূমিহীনে পরিণত হয়েছে এবং প্রায় প্রত্যেকটি পরিবার কিছু পরিমাণে চাষযোগ্য জমি হারিয়েছে । অনেকেই পেশা পরিবর্তন, বিয়ে, চিকিৎসা ইত্যাদি কারণে জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে ।

৩.৩.২ *ঋণগ্রহীতাদের পরিবারের গবাদিপশুর (গরু, মহিষ ইত্যাদি) মালিকানা*

সারণী ৩.৮ : ঋণগ্রহীতাদের পরিবারের গবাদিপশুর মালিকানা

গবাদিপশুর সংখ্যা (গরু,মহিষ ইত্যাদি)	বর্তমানে		ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের পূর্বে	
	গণসংখ্যা	শতকরা	গণসংখ্যা	শতকরা
০০-০০	১১০	৮১.৪৮	১০৬	৭৮.৫২
০১	১৮	১৩.৩৩	২৩	১৭.০৭
০২	৪	৩.৯৬	৬	৪.৪৪
০৩ বা এর অধিক	৩	২.২২	০	০
মোট	১৩৫	১০০	১৩৫	১০০

উৎস ঃ জরিপ-২০০৬

সারণী ৩.৯ : ঋণগ্রহীতাদের পরিবারের ছোট আকারের গবাদিপশুর(ছাগল,ভেড়া ইত্যাদি) মালিকানা

ছোট আকারের গবাদিপশুর সংখ্যা (ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি)	বর্তমানে		ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের পূর্বে	
	গণসংখ্যা	শতকরা	গণসংখ্যা	শতকরা
০০-০০	১০৫	৭৭.৭৮	১০৩	৭৬.৩০
০১	১২	৮.৮৯	১৬	১১.৮৫
০২	১০	৭.৪১	৮	৫.৯৩
০৩	৫	৩.৭০	৬	৪.৪৪
০৪ বা এর অধিক	৩	২.২২	২	১.৪৮
মোট	১৩৫	১০০	১৩৫	১০০

পল্লী এলাকার দরিদ্র পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক সামর্থ্যের একটি অন্যতম নির্দেশক গবাদিপশুর মালিকানা। নিম্নে সারণী ৩.৮ এর মাধ্যমে নির্বাচিত ঋণগ্রহীতাদের পরিবারের গবাদিপশুর মালিকানার চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

সারণী ৩.৮ থেকে আমরা দেখতে পাই ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের পূর্বে কোন গবাদিপশু (গরু বা মহিষ) ছিল না ৭৮.৫২% উত্তরদাতার পরিবারের। আর ১টি এবং ২টি করে গবাদি পশু (গরু, মহিষ) ছিল যথক্রমে ১৭.০৪% ও ৪.৪৪% পরিবারের। জরিপকালীন সময়ে দেখা গেছে ৮১.৪৮% ঋণগ্রহীতার পরিবারের কোন গবাদিপশু ছিল না আর ১টি, ২টি এবং ২ এর বেশী সংখ্যক গবাদি পশু ছিল যথাক্রমে ১৩.৩৩%, ২.৯৬% ও ২.২২% পরিবারের । অর্থাৎ ঋণ গ্রহণের পর ২.৯৬% পরিবার তাদের গরু বা মহিষ বিক্রি করে দিয়েছে।

সারণী ৩.১০ : ঋণগ্রহণকারীদের পরিবারের পৌলট্রির মালিকানা

পৌলট্রির সংখ্যা	বর্তমানে		ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণেরপূর্বে	
	গণসংখ্যা	শতকরা	গণসংখ্যা	শতকরা
০০-০০	৬৫	৪৮.১৫	৫২	৩৮.৫২
০-৫	২৫	১৮.৫২	৩৩	২৪.৪১
৬-১০	২৪	১৭.৭৮	২০	১৪.৪১
১১-১৫	৯	৬.৬৭	১৭	১২.৬০
১৬-২০	৭	৫.১৮	১০	৭.৪১
২১ বা এর অধিক	৫	৩.৭০	৩	২.২২
মোট	১৩৫	১০০	১৩৫	১০০

উৎস ঃ জরিপ-২০০৬

৩.৩.৩ ছোট আকারের গবাদিপশুর (ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি) মালিকানা

নিম্নের সারণী ৩.৯ এর মাধ্যমে ঋণগ্রহণের পূর্বে ও জরিপকালীন সময়ে ঋণগ্রহীতা পরিবারগুলোর ছোট আকারের গবাদিপুশুর (ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি) সংখ্যা দেখানো হলো।

সারণী ৩.৯ থেকে দেখা যায় ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের পর উত্তরদাতা পরিবারগুলোর ছোট আকারের গবাদিপশুর (ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি) মালিকানায় খুব সামান্যই পরিবর্তন এসেছে।

৩.৩.৪ ঋণগ্রহনকারীদের পরিবারের পৌলট্রি মালিকানা

নিম্নে সরণী ৩.১০ এর মাধ্যমে ঋণগ্রহণকারীদের পরিবারের ঋণগ্রহণের পূর্বে ও জরিপকালীন সময়ে ঋণগ্রহণকারী পরিবারগুলোর পৌলট্রির মালিকানার চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

সারণী ৩.১১ : মূলধনী পণ্যের মালিকানা

মূলধনী পণ্যের সংখ্যা	বর্তমানে		ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের পূর্বে	
	গণসংখ্যা	শতকরা	গণসংখ্যা	শতকরা
০০	১১০	৮১.৪৭	১২০	৮৮.৮৯
০১	২০	১৪.৮১	১৩	৯.৬৩
০২ বা এর অধিক	৫	৩.৭০	২	১.৪৮
মোট	১৩৫	১০০	১৩৫	১০০

উৎস ঃ জরিপ-২০০৬

সারণী ৩.১০ থেকে দেখা যায় ঋণ নেয়ার পূর্বে কোন পৌলট্রি ছিল না ৩৮.৫২% পরিবারের। আর জরিপকালীন সময়ে দেখা যায় ঋণগ্রহনকারী পরিবারগুলোর মধ্যে ৪৮.১৫% এর কোন পৌলট্রি ছিল না অর্থ্যাৎ ৯.৬৩% পরিবার ঋণ গ্রহণের পর তাদের সব পৌলট্রি হারিয়েছে।

৩.৩.৫ ঋণগ্রহণকারীদের পরিবারের মূলধনী পণ্যের মালিকানা

এখানে মূলধনী পণ্য বলতে রিক্সা, ভ্যান, অগভীর নলকূপ, সেলাই মেশিন ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। সারণী ৩.১১ এর মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা পরিবারগুলোর মূলধনী পণ্যের মালিকানার চিত্র উপস্থাপন করা

সারণী ৩.১২ : ঋণগ্রহীতাদের বাড়ির অবস্থা

বাড়ির ধরন	বর্তমানে		ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের পূর্বে	
	গণসংখ্যা	শতকরা	গণসংখ্যা	শতকরা
গৃহহীন	১	০.৭৪	৩	২.২২
খড়ের ঘর	২৫	১৮.৫২	৪৫	৩৩.৩৩
টিনের চাল ও বাঁশের ঘর	৬৫	৪৮.১৫	৫৮	৪২.৯৬
টিনের চালের আধা পাকা ঘর	৪২	৩১.১১	২৮	১৮.৬৬
পাকা বাড়ি	২	১.৪৮	১	০.৭৪
মোট	১৩৫	১০০	১৩৫	১০০

উৎস ঃ জরিপ-২০০৬

হলো।

সারণীতে দেখা যায় ঋণ গ্রহণের পূর্বে ১টি ও ২টি মূলধনী পণ্য ছিল যথাক্রমে ৯.৬৩% ও ১.৪৮% উত্তরদাতার পরিবারের। আর জরিপকালীন সময়ে দেখা যায় ১টি ও ২টি করে মূলধনী দ্রব্য ছিল যথাক্রমে ১৪.৮১% ও ৩.৭৫% পরিবারের । অর্থ্যাৎ মাত্র ৭.৪% পরিবার ঋণগ্রহণের মাধ্যমে নতুন করে মূলধনী পণ্যের মালিক হতে পেরেছে।

৩.৩.৬ *ঋণগ্রহণকারীদের বাড়ির অবস্থা*

গ্রামীণ ব্যাংকসহ অন্যান্য ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান গৃহনির্মানের জন্য বিপুল পরিমাণ ঋণপ্রদান করেছে। সারণী ৩.১২ এর মাধ্যমে ঋণ গ্রহণকারীদের পরিবারের বাড়ির অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হলো।

সারণী ৩.১২ থেকে দেখা যাচ্ছে ঋণ গ্রহণের পূর্বে নির্বাচিত ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে ২.২২% গৃহহীন ছিল।

সারণী ৩.১৩ : ঋণগ্রহীতা পরিবারগুলোর খাদ্যের নিরাপত্তা

খাদ্যের নিরাপত্তা	বর্তমানে		ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের পূর্বে	
	গণসংখ্যা	শতকরা	গণসংখ্যা	শতকরা
খাদ্যের নিরাপত্তা আছে	১০৮	৮০.০০	৬০	৪৪.৪৪
খাদ্যের নিরাপত্তা নেই	২৭	২০.০০	৭৫	৫৫.৫৬
মোট	১৩৫	১০০	১৩৫	১০০

উৎস ঃ জরিপ-২০০৬

আর টিনের চাল ও বাঁশের ঘর, টিনের চালের আধাপাকা বাড়ি এবং পাকা বাড়ি ছিল যথাক্রমে ৪২.৯৬%, ১৮.৬৬% ও ০.৭৪% উত্তর দাতার। ঋণগ্রহণের পর জরিপকালীন সময়ে দেখা যায় মাত্র ০.৭৪% ঋণগ্রহীতা গৃহহীন ছিল। এছাড়া ৪৮.১৫%,৩১.১১%,১.৪৮% উত্তর দাতার বাড়ির অবস্থা ছিল যথাক্রমে টিনের চাল ও বাঁশের ঘর, টিনের চালের আধাপাকা বাড়ি এবং পাকা বাড়ি। উপরোক্ত সারণী থেকে বলা যায় ঋণগ্রহণের পর ঋণগ্রহীতা পরিবারগুলোর বাড়ির অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

৩.৩.৭ *ঋণগ্রহণকারীদের পরিবারের খাদ্যের নিরাপত্তা*

বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরটি একটি বিকাশমান এবং গতিশীল সিস্টেমের প্রতিনিধিত্ব করে, যা দরিদ্রদের জীবনে বিভিন্ন পরিবর্তন এবং প্রয়োজনে সাড়া দিতে সক্ষম। ঋণের টাকা ব্যবহার করে অনেক ঋণগ্রহণকারী পরিবার খাদ্যের নিরাপত্তা আনতে সক্ষম হয়েছে। নিম্নে সারণী ৩.১৩ এর মাধ্যমে ঋণগ্রহীতাদের পরিবারের খাদ্যের নিরাপত্তার চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

সারণী ৩.১৩ থেকে দেখা যায় ঋণ গ্রহণের পূর্বে মাত্র ৪৪.৪৪% নির্বাচিত ঋণগ্রহীতার পরিবারের খাদ্যের নিরাপত্তা ছিল। কিন্তু ঋণ গ্রহণের পর জরিপকালীন সময়ে দেখা যায় ৮০.০০% ঋণগ্রহীতার পরিবার ঋণগ্রহণের মাধ্যমে খাদ্যের নিরাপত্তা আনতে সক্ষম হয়েছে।

৩.৪ *ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য ও অর্জন*

৩.৪.১ *ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য*

আমাদের সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, বেশীর ভাগ ঋণগ্রহীতা অ-কৃষি কর্মকান্ডের কথা উল্লেখ করে ঋণগ্রহণ করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ঋণগ্রহীতা ক্ষুদ্র ব্যবসার কথা উল্লেখ করেছে।

৩.৪.২ ঋণগ্রহণকারী পরিবারগুলোর ঋণের ব্যবহার

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় ঋণগ্রহণকারীরা ঋণগ্রহণের যে উদ্দেশ্য দেখিয়ে ঋণ গ্রহণ করে বাস্তবে সেই উদ্দেশ্য বা খাতে ঋণের টাকাটা ব্যবহার করে না। আমাদের সমীক্ষায় নির্বাচিত ঋণগ্রহীতাদের গ্রহণকৃত

সারণী ৩.১৪ : ঋণের আকার ও আয় স্তর (টাকা)

ঋণের আকার	পরিবারের গড় বাৎসরিক আয়	পরিবারের গড় আকার	পরিবারের মাথাপিছু গড় বাৎসরিক আয়
৫০০০ পর্যন্ত	২৯৮০০	৬	৪৯৬৬
৫০০১-৭০০০	৫৪০০০	৫.৮	৯৪৮২
৭০০১-৯০০০	৬২০০০	৫	১২৪০০
৯০০০ এর অধিক	৬৫৯০০	৫	১৩১৮০

উৎস ঃ জরিপ-২০০৬

ঋণের ব্যবহারের চিত্র থেকে দেখা যায় যে, ঋণগ্রহণের প্রথম বছরে ঋণগ্রহীতা পরিবারগুলোর ঋণের টাকার সম্পূর্ণ অংশ উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার করেছে মাত্র ৮.৮৯% পরিবার। ৬০% পরিবার ঋণের টাকা আংশিক উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার করেছে। আর ৩১.১০% পরিবার ঋণের টাকার কোন অংশই উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার করেণি। অন্যদিকে জরিপকালীন সময়ে দেখা গেছে চলতি বছরে ঋণগ্রহণকারী পরিবারগুলোর মধ্যে ঋণের টাকার সম্পূর্ণ অংশ ও আংশিক উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার করেছে যথাক্রমে ৫.৯৩%, ও ৫৪.০৭% ঋণগ্রহণকারীর পরিবার। অর্থাৎ ক্ষুদ্রঋণগ্রহীতাদের বড় অংশই গ্রহণকৃত ঋণের টাকা উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার করে না।

সারণী ৩.১৫ : চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট পরিমাণ ঋণ পাওয়া ঋণগ্রহীতার সংখ্যা

চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রাপ্তির অবস্থা	বর্তমান বছরে		ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের প্রথম বছরে	
	গণসংখ্যা	শতকরা	গণসংখ্যা	শতকরা
যথেষ্ঠ পরিমাণ ঋণ পায়নি	৯৯	৭৩.৩৩	১২৫	৯২.৫৯
যথেষ্ঠ পরিমাণ ঋণ পেয়েছে	৩৬	২৬.৬৭	১০	৭.৪১
মোট	১৩৫	১০০	১৩৫	১০০

উৎস ঃ জরিপ-২০০৬

৩.৪.৩ ঋণের আকার এবং ঋণগ্রহণকারীদের পরিবারের আয়স্তর

সারণী ৩.১৪ এর মাধ্যমে ঋণের আকার এবং ঋণ গ্রহীতার পরিবারের আয় স্তরের মধ্যে সম্পর্ক

দেখানো হলো ।

সারণী ৩.১৪ থেকে আমরা ঋণের আকার এবং পরিবারের আয়স্তরের মধ্যে একটি ধনাত্মক সম্পর্ক দেখতে পাই । ছোট আকারের (৫০০০ টাকা পর্যন্ত) ঋণের গ্রাহকদের আয় বড় আকারের (৯০০০ এর

সারণী ৩.১৬ : সুদের হার সম্পর্কে মন্তব্য

সুদের হার	গণসংখ্যা	শতকরা
৫%-১০%	২০	১৪.৮১
১০%-১৫%	১০১	৭৪.৮১
১৫%-২০%	১১	৮.১৫
২০%-২৫%	৩	২.২২
২৫% এর বেশী	০	০
মোট	১৩৫	১০০

উৎস ঃ জরিপ-২০০৬

বেশী) ঋণের গ্রাহকদের আয়ের চেয়ে কম । ৫০০০ পর্যন্ত, ৫০০১-৭০০০, ৭০০১-৯০০০ এবং ৯০০০ টাকার বেশী আকারের ঋণগ্রহীতাদের পরিবারের সদস্যদের মাথাপিছু গড় বাৎসরিক আয় যথাক্রমে ৪৯৬৬ টাকা, ৯৪৮২ টাকা, ১২৪০০ টাকা এবং ১৩১৮০ টাকা ।

৩.৪.৪ যথেষ্ট পরিমাণ ঋণ পাওয়া ঋণগ্রহীতার সংখ্যা

নিম্নের সারণী ৩.১৫ এর মাধ্যমে চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট পরিমাণ ঋণ পাওয়া ঋণগ্রহীতার হার দেখানো হলো ।

সারণী ৩.১৫ থেকে দেখা যায় ঋণগ্রহণের প্রথম বছর ও চলতি বছরে ৯২.৫৯% ও ৭৩.৩৩%

সারণী ৩.১৭ : একাধিক ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণগ্রহণকারীর সংখ্যা

ঋণগ্রহীতাদের পরিবার কতৃক ব্যবহারকৃত ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	গণসংখ্যা	শতকরা
০১	৫৫	৪১.৭৪
০২	৪৭	৩৪.৮১
০৩	২৫	১৮.৫২
০৪ বা এর অধিক	৮	৫.৯২
মোট	১৩৫	১০০

উৎস ঃ জরিপ-২০০৬

ঋণগ্রহীতার পরিবার চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট পরিমাণ ঋণ পায়নি ।

৩.৪.৫ ঋণের সুদের হার সম্পর্কে মন্তব্য

নিম্নের সারণী ৩.১৬ এর মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণের সুদের হারটা কি রকম হওয়া উচিৎ সেই সম্পর্কে ঋণগ্রহীতাদের মন্তব্য তুলে ধরা হলো ।

সারণী ৩.১৬ থেকে দেখা যায় ৭৪.৮১% উত্তরদাতা মনে করেন যে সুদের হারটা ১০%-১৫% এর মধ্যে হলে ভাল হয় । কিন্তু বাংলাদেশের প্রায় সব ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান ১৫% বা এর বেশী হারে সুদ আদায় করে থাকে ।

৩.৪.৬ নিয়মিত কিস্তি টাকা পরিশোধের ক্ষেত্রে অর্থায়নের উৎস

সমীক্ষায় ঋণগ্রহণকারীদের পরিবারের নিয়মিত ঋণের কিস্তির টাকা পরিশোধের জন্য অর্থের উৎস সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা যায় । দেখা যায় যে, প্রাথমিকভাবে বছরের প্রথম চতুর্থাংশে ঋণগ্রহীতাদের একটা বড় অংশ ঋণের অব্যবহৃত টাকা দ্বারা ঋণের কিস্তি পরিশোধ করে । বছরের দ্বিতীয় চতুর্থাংশে ঋণের কিস্তি পরিশোধের জন্য অনেকেই আত্মীয় ও বন্ধুদের কাছে ধার নেয় । বছরের তৃতীয় ও চতুর্থাংশে অন্যান্য উৎস ছাড়াও কোন ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে নতুন করে নেয়া ঋণও কিস্তির টাকা পরিশোধের একটি অন্যতম উৎস । এ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ঋণের টাকা ব্যবহার করে যে মুনাফা হয় তা দ্বারা ঋণের কিস্তি পরিশোধকারীর সংখ্যা নেই বললেই চলে । অর্থাৎ ঋণগ্রহীতারা ঋণের টাকা আয়বর্ধক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ করতে পারেনি ।

সারণী ৩.১৮ : ঋণগ্রহীতা পরিবার কতৃক ঋণের অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস ব্যবহার

ঋণগ্রহণকৃত অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের সংখ্যা	বর্তমানে		ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের পূর্বে	
	গণসংখ্যা	শতকরা	গণসংখ্যা	শতকরা
০০	৮৯	৬৫.৯৩	১১০	৮১.৪৫
০১	২৫	১৮.৫২	১১	৮.১৫
০২ বা এর বেশী	২১	১৫.৫৬	১৪	১০.৩৭
মোট	১৩৫	১০০	১৩৫	১০০

উৎস ঃ জরিপ-২০০৬

৩.৪.৭ একই সাথে একাধিক ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ক্ষুদ্রঋণগ্রহণকারী পরিবারের সংখ্যা

সারণী ৩.১৭ এর মাধ্যমে একই সাথে একাধিক ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণগ্রহণকারীর সংখ্যা উপস্থাপন করা হলো ।

সারণী ৩.১৭ থেকে দেখা যায় মাত্র ৪১.৭৪% নির্বাচিত ঋণগ্রহীতা পরিবার একটি উৎস থেকে ঋণগ্রহণ করে । আর ২, ৩ এবং ৪ বা এর অধিক সংখ্যক ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করে যথাক্রমে ৩৪.৮১%, ১৮.৫১% এবং ৫.৯২% ঋণগ্রহীতা পরিবার ।

৩.৪.৯ ঋণগ্রহীতা পরিবারগুলোর ঋণের অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস ব্যবহার

নিম্নের সারণী ৩.১৮ এম মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা পরিবারগুলোর ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণগ্রহণের পূর্বে ও জরিপকালীন সময়ে অ-প্রতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণগ্রহণের পরিমাণ তুলে ধরা হলো ।

সারণী ৩.১৮ থেকে দেখা যায় ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণগ্রহণের পূর্বে ৮১.৪৫% ঋণগ্রহীতার পরিবার অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করতো । জরিপকালীন সময়ে অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ৬৫.৯৩% এ নেমে আসে, আর ১৮.৫২% ও ১৫.৫৬% ঋণগ্রহণকারী পরিবার যথাক্রমে ১টি ও ২টি অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করতো । অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে

সারণী ৪.১ : বাৎসরিক মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে নির্বাচিত পরিবারগুলোর দারিদ্র্য স্ড়রের পরিবর্তন

বাৎসরিক মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে দারিদ্র্য শ্রেণী	ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের পূর্বে		বর্তমানে	
	গণসংখ্যা	শতকরা	গণসংখ্যা	শতকরা
চরম দরিদ্রঃ বাৎসরিক ৩৫৬০ টাকা পর্যন্তমাথাপিছু আয়	১২	৮.৮৯	৭	৫.১৯
দরিদ্রঃ বাৎসরিক ৩৫৬০-৭১৩৫টাকা পর্যন্ত মাথাপিছু আয়	৮৪	৬২.২২	৮৫	৬২.৯৬
অ-দরিদ্রঃ বাৎসরিক ৭১৩৫ টাকার চেয়ে বেশী মাথাপিছু আয়	৩৯	২৮.৮৯	৪৩	৩১.৮৫
মোট	১৩৫	১০০	১৩৫	১০০

উৎসঃ জরিপ-২০০৬

ঋণ গ্রহণের হার বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে ।

চতুর্থ অধ্যায়

ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের পর নির্বাচিত পরিবারগুলোর দারিদ্র্য পরিস্থিতি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন

কমপক্ষে ৫ বছর ধরে গ্রামীণ ব্যাংক, আশা, প্রশিকা, ব্র্যাক বা ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ থেকে

সারণী ৪.২ : ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের পর নির্বাচিত পরিবারগুলোর মোট আয়ের পরিবর্তন

মোট আয়ের পরিবর্তন	গণসংখ্যা	শতকরা
বৃদ্ধি পেয়েছে	৮৯	৬৪.৯২
হ্রাস পেয়েছে	২৫	১৮.৫২
অপরিবর্তিত রয়েছে	২১	১৫.৫৬
মোট	১৩৫	১০০

উৎসঃ জরিপ-২০০৬

ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করছে এমন পরিবারগুলো ঋণের ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কি পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে তা আমরা গবেষণার মাধ্যমে বের করার চেষ্টা করেছি।

৪.১.১ বাৎসরিক মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে ঋণগ্রহীতা পরিবারগুলোর দারিদ্র্য স্তরের পরিবর্তন

নিম্নের সারণী ৪.১ এর মাধ্যমে বাৎসরিক মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে নমুনা ঋণগ্রহীতা পরিবারগুলোর দারিদ্র্য স্তরের পরিবর্তন দেখানো হলো।

সারণী ৪.৩ : দারিদ্র্য শ্রেণীর ভিত্তিতে নির্বাচিত পরিবারগুলোর মোট আয়ের পরিবর্তন

দারিদ্র্য শ্রেণী	আয়ের পরিবর্তন						পরিবারের সংখ্যা	
	অপরিবর্তিত রয়েছে		বৃদ্ধি পেয়েছে		হ্রাস পেয়েছে			
	গণ সংখ্যা	শতকরা	গণ সংখ্যা	শতকরা	গণ সংখ্যা	শতকরা	গণ সংখ্যা	শতকরা
চরম দরিদ্রঃ বাৎসরিক ৩৫৬০ টাকা পর্যন্তমাথাপিছু আয়	৩	২.২২	৭	৫.১৯	২	১.৪৮	১২	৮.৮৯
দরিদ্রঃ বাৎসরিক ৩৫৬০-৭১৩৫টাকা পর্যন্ত মাথাপিছু আয়	২৬	১৯.২৬	৩৬	২৬.৬৭	২২	১৬.৩০	৮৪	৬২.২২
অ-দরিদ্রঃবাৎসরিক ৭১৩৫ টাকার চেয়ে বেশী মাথাপিছু আয়	১৭	১২.৫৯	১৩	৯.৬৩	৯	৬.৬৭	৩৯	২৮.৮৯
মোট	৪৬	৩৪.০৭	৫৬	৪১.৪৯	৩৩	২৪.৪৪	১৩৫	১০০

উৎসঃ জরিপ-২০০৬

সারণী ৪.১ থেকে দেখা যাচ্ছে ঋণগ্রহণের পূর্বে নির্বাচিত ঋণগ্রহীতা পরিবারগুলোর মধ্যে চরম দরিদ্র, দরিদ্র এবং অ-দরিদ্র শ্রেণীর অন্তভূক্ত ছিল যথাক্রমে ৮.৮৯%, ৬২.২২% ও ২৮.৮৯% পরিবার। আর জরিপকালীন সময়ে দেখা যায় ঋণগ্রহীতা পরিবারগুলোর মধ্যে চরম দরিদ্র, দরিদ্র এবং অ-দরিদ্র শ্রেণীর অন্তভুক্ত ছিল যথাক্রমে ৫.১৯%, ৬২.৯৬% ও ৩১.৮৫% পরিবার। অর্থ্যাৎ ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের পর ৮.৮৯% চরম দরিদ্র্য পরিবারের মধ্যে ৩.৭০% পরিবার চরম দারিদ্র্য সীমা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু দরিদ্র পরিবারগুলোর অ-দরিদ্র অবস্থায় পৌছানোর হার খুবই কম। চরম দরিদ্র পরিবারগুলো ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সহায়তায় কার্যকরভাবে চরম দরিদ্র অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলেও, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত। তাই বলা যায় ক্ষুদ্রঋণ চরম দারিদ্র্য হ্রাস করতে কিছুটা সাফল্য দেখালেও অ-দরিদ্র অবস্থায় পৌছানোর জন্য ক্ষুদ্রঋণ যথেষ্ট নয়।

সারণী ৪.৪ : ঋণগ্রহীতাদের পরিবারের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সূচকের পরিবর্তন

	সূচক সমূহ	বৃদ্ধি পেয়েছে	হ্রাস পেয়েছে	অপরিবর্তিত রয়েছে	মোট
১	চাষযোগ্য জমির পরিমাণ	৮(৫.৯৩%)	২৪(১৭.৭৮%)	১০৩(৭৬.৩০%)	১৩৫(১০০%)
২	বাড়ির অবস্থা	২৩(১৭.০৪%)	৮(৫.৯৩%)	১০৪(৭৭.০৪%)	১৩৫(১০০%)
৩	গবাদিপশুর পরিমাণ	৩(২.২২%)	৯(৬.৬৭%)	১২৩(৯১.১১%)	১৩৫(১০০%)
৪	পৌলট্রির পরিমাণ	১২(৮.৮৯%)	৩৩(২৪.৪৪%)	৯০(৬৬.৬৭%)	১৩৫(১০০%)
৫	ভূমিবহির্ভূত সম্পদের পরিমাণ	১১(৮.১৫%)	৫(৩.৭০%)	১১৯(৮৮.১৫%)	১৩৫(১০০%)
৬	সামগ্রিক ঋণবদ্ধতা	১০১(৭৪.৮১%)	৫(৩.৭০%)	২৯(২১.৪৮%)	১৩৫(১০০%)
৭	স্বাস্থ্য পায়খানার ব্যবহার	১৩(৯.৬৩%)	০(০%)	১২২(৯০.৩৭%)	১৩৫(১০০%)
৮	বিশুদ্ধ পানীয় জলের উৎস	১৮(১৩.৩৩%)	০(০%)	১১৭(৮৬.৮৭%)	১৩৫(১০০%)
৯	খাদ্যের নিরাপত্তা	৪৬(৩৪.০৪%)	৩(২.২২%)	৮৬(৬৩.৭০%)	১৩৫(১০০%)
১০	মূলধনী দ্রব্য	১০(৭.৪১%)	৩(২.২২%)	১২২(৯০.৩৭%)	১৩৫(১০০%)
১১	অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে ঋণ গ্রহণ	৫৬(৪১.৪৮%)	৮(৫.৯৩%)	৭১(৫২.৫৯%)	১৩৫(১০০%)
১২	বিদ্যুৎ সুবিধা	১৭(১২.৫৯%)	০(০%)	১১৮(৮৭.৪১%)	১৩৫(১০০%)
১৩	জামা কাপড়ের খরচ	৩১(২২.৯৬%)	৫(৩.৭০%)	৯৯(৭৩.৩৩%)	১৩৫(১০০%)
১৪	উপযুক্ত চিকিৎসা সেবা	২২(১৬.২৯%)	০(০%)	১১৩(৮৩.৭০%)	১৩৫(১০০%)
১৫	বাচ্চাদের স্কুল-থেকে ঝরে পরার হার	১২(৮.৮৯%)	৮(৫.৯৩%)	১১৫(৮৫.১৯%)	১৩৫(১০০%)
১৬	মোবাইল ফোনের ব্যবহার	৬৯(৫১.১১%)	০(০%)	৬৬(৪৮.৮৯%)	১৩৫(১০০%)

উৎসঃ জরিপ-২০০৬

এখানে আরেকটি লক্ষ্যনীয় বিসয় হলো ঋণগ্রহীতাদের বড় অংশই অদরিদ্র ।

৪.১.২ মোট আয়ের পরিবর্তন

নিম্নে সারণী ৪.২ এর মাধ্যমে নির্বাচিত ঋণগ্রহীতা পরিবারগুলোর মোট আয়ের পরিবর্তন তুলে ধরা হলো ।

উপরোক্ত সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের পর নির্বাচিত ঋণগ্রহীতা পরিবারগুলোর মধ্যে মোট আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, হ্রাস পেয়েছে এবং অপরিবর্তিত রয়েছে যথাক্রমে ৬৪.৯%, ১৮.৫২% ও ১৫.৫৬% । তাই বলা যায় মোট আয়ের পরিবর্তনের উপর ক্ষুদ্রঋণের প্রভাব ধনাত্মক ।

৪.১.৩ দারিদ্র্য শ্রেণীর ভিত্তিতে নির্বাচিত পরিবারগুলোর মোট আয়ের পরিবর্তন

সারণী ৪.৩ এর মাধ্যমে দারিদ্র্য শ্রেণীর ভিত্তিতে নির্বাচিত পরিবারগুলোর মোট আয়ের পরিবর্তন দেখানো হলো ।

সারণী ৪.৩ থেকে দেখা যাচ্ছে চরম দরিদ্র শ্রেণীর ৮.৮৯% পরিবারের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের পর ৫.১৯% পরিবার তাদের আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে, আর আয় কমেছে ১.৪৮% পরিবারের । তাই বলা যায় চরম দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের আয়ের উপর ক্ষুদ্রঋণের প্রভাব ইতিবাচক । কিন্তু ক্ষুদ্রঋণ দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের আয়ের লক্ষ্যনীয় কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি । তবে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের পর অ-দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের আয়ের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে ।

৪.২ নির্বাচিত ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের পরিবারের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সূচকের উপর ক্ষুদ্রঋণের প্রভাব

ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের পর নির্বাচিত ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের পরিবারের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সূচকের যে পরিবর্তন ঘটেছে তা সারণী ৪.৪ এ দেখানো হলো ।

৪.২.১ চাষযোগ্য জমির মালিকানার পরিবর্তন

সারণী ৪.৪ থেকে দেখা যায় ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের পর নির্বাচিত ঋণগ্রহীতা পরিবারগুলোর মধ্যে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বেড়েছে, কমেছে এবং অপরিবর্তিত রয়েছে যথাক্রমে ৫.৯৩%, ১৭.৭৮% ও ৭৬.৩০% পরিবারের যা ঋণগ্রহীতাদের চাষযোগ্য জমির পরিমাণের উপর ক্ষুদ্রঋণের ঋণাত্মক প্রভাবকে নির্দেশ করছে ।

৪.২.২ বাড়ির অবস্থার পরিবর্তন

ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের পর ১৭.০৪% পরিবারের বাড়ির অবস্থার উন্নতি ঘটেছে আর ৫.৯৩% পরিবারের বাড়ির অবস্থার অবনতি ঘটেছে, তাই বলাযায় ঋণগ্রহীতাদের বাড়ির অবস্থার উপর ক্ষুদ্রঋণের প্রভাব ধনাত্মক ।

৪.২.৩ গবাদি পশুর পরিমাণ

ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের একটা বড় অংশ গবাদিপশু ক্রয় ও মোটাতাজাকরণের কথা বলে ঋণ গ্রহণ করলেও সারণী ৪.৪ থেকে দেখা যায় যাচ্ছে ঋণগ্রহণের পর গবাদিপশুর পরিমাণ বেড়েছে মাত্র ২.২২%

পরিবারের। আর গবাদিপশুর পরিমাণ কমেছে ৬.৬৭% পরিবারের। তাই এটা পরিষ্কার যে ঋণগ্রহীতাদের পরিবারের গবাদিপশুর পরিমাণের উপর ক্ষুদ্রঋণের প্রভাব ঋণাত্মক।

৪.২.৪ পৌলট্রির পরিমাণ

সারণী ৪.৪ থেকে দেখা যায় ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের পর পৌলট্রির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে২৪.৪৪% ঋণগ্রহীতার পরিবারের। আর মাত্র ৮.৮৯% পরিবারের পৌলট্রির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বলা যায় ঋণগ্রহীতাদের পরিবারের পৌলট্রির পরিমাণের উপর ক্ষদ্রঋণের প্রভাব ঋণাত্মক।

৪.২.৫ ভূমিবহির্ভূত সম্পদের পরিমাণের পরিবর্তন

সারণী ৪.৪ থেকে দেখা যায় ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের পর ভূমিবহির্ভূত সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ও হ্রাস পেয়েছে যথাক্রমে ৮.১৫% ও ৩.৭০% ঋণগ্রহীতাদের পরিবারের । তাই বলা যায় ঋণগ্রহীতাদের পরিবারের ভূমিবর্হিভূত সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণের প্রভাব থাকলেও তা যথেষ্ট নয়।

৪.২.৬ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার

সময়ের সাথে সাথে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে পরিবর্তনটা ইতিবাচক।

৪.২.৭ সামগ্রিক ঋণবদ্ধতা

ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যুক্ত হওয়ার পর ক্ষেত্রে সামগ্রিক ঋণবদ্ধতা বৃদ্ধি পেয়েছে, হ্রাস পেয়েছে এবং অপরিবর্তিত রয়েছে যথাক্রমে ৭৪.৮১%, ৩.৭০% ও ২১.৪৮% পরিবারের যা নিম্নের পাই চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়েছে। তাই বলা যায় ক্ষুদ্রঋণ নির্বাচিত পরিবারগুলোর সামগ্রিক ঋণবদ্ধতা বৃদ্ধি করেছে।

৪.২.৮ বিশুদ্ধ পানীয় জলের উৎস

সারণী ৪.৪ থেকে দেখা যায় ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের পর ১৩.৩৩% ঋণগ্রহীতার পরিবারের বিশুদ্ধ পানীয় জলের উৎসের উন্নতি ঘটেছে অনেকেই নলকূপ স্থাপনের কারণে এই ইতিবাচক পরিবর্তনটা এসেছে।

৪.২.৯ খাদ্যের নিরাপত্তা

সারণী ৪.৪ থেকে দেখা যায় ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের পর ৩৪.০৭% পরিবারের খাদ্যের নিরাপত্তা বেড়েছে। আর কমেছে ২.২২% পরিবারের তাই বলা যায় ঋণগ্রহীতাদের পরিবারের খাদ্যের নিরাপত্তা আনয়নে ক্ষুদ্রঋণ সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করছে।

৪.২.১০ মূলধনী পণ্যের পরিমাণ

সারণী ৪.৪ থেকে দেখা যায় ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের পর ঋণগ্রহীতাদের পরিবারের মূলধণী পণ্যের পরিমাণ

সামান্য বেড়েছে তবে তা যথেষ্ট নয় ।

৪.২.১১ অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে উচ্চ সুদের হারে ঋণগ্রহণ

ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ঋণ গ্রহণের পর অনেক ক্ষেত্রেই ঋণগ্রহীতা পরিবারগুলো ঋণের কিস্তি পরিশোধ করার জন্য বা অন্যান্য প্রয়োজনে অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে উচ্চ সুদের হারে ঋণগ্রহণ করে । সারণী ৪.৪ থেকে দেখা যায় ঋণ গ্রহণের পর নির্বাচিত পরিবারগুলোর মধ্যে অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে,হ্রাস পেয়েছে ও অপরিবর্তিত রয়েছে যথাক্রমে ৪১.৪৮%, ৫.৯৩% ও ৫২.৫৯% পরিবারের ।

৪.২.১২ বিদ্যুৎ সুবিধা

ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের পর ১২.৫৯% ঋণগ্রহীতার পরিবার নতুন করে বিদ্যুৎ সুবিধা উপভোগের সামর্থ অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে ।

৪.২.১৩ জামা কাপড়ের জন্য খরচ

সারণী ৪.৪ থেকে দেখা যায় ঋণগ্রহণের পর নির্বাচিত ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে ২২.৯৬% এর জামাকাপড়ের খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে

৪.২.১৪ উপযুক্ত চিকিৎসা সেবা

বিগত কয়েক দশকে মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যসচেতনতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসকের কাছ থেকে চিকিৎসা সেবা নেওয়ার হার বৃদ্ধি পেয়েছে । সারণী ৪.৪ থেকে দেখা যায়

নির্বাচিত ঋণগ্রহীতা পরিবারগুলোর মধ্যে ১৬.৩০% পরিবারের যোগ্যতা সম্পন্ন চিকিৎসকের কাছ থেকে চিকিৎসাসেবা নেয়ার হার বৃদ্ধি পেয়েছে যা ক্ষুদ্রঋণের একটি ইতিবাচক দিক।

৪.২.১৫ বাচ্চাদের স্কুল থেকে ঝরে পরার হার

ঋণগ্রহণের পর ঋণের কিস্তি পরিশোধের জন্য অনেকেই তাদের বাচ্চাদের আয় সৃষ্টিকারী কর্মকান্ডে নিয়োজিত করেছে। তাই ঋণগ্রহণের পর পরিবারগুলোতে বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়া থেকে বিরত থাকার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণী ৪.৪ থেকে দেখা যায় ঋণগ্রহণের পর ঋণগ্রহীতা পরিবারগুলোতে বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়া থেকে বিরত থাকার হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪.২.১৬ মোবাইল ফোনের ব্যবহার

সারণী ৪.৪ থেকে দেখা যাচ্ছে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণের পর ৫১.১১% পরিবারে মোবাইল ফোনের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকেই গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণের মাধ্যমে পল্লীফোন নিয়ে ব্যবসা করছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি ক্ষুদ্রঋণ দরিদ্র ঋণগ্রহীতাদের দারিদ্র্য পরিস্থিতি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর তেমন কোন ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারেনি। ঋণ গ্রহণের পর ঋণ গ্রহীতাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকের মধ্যে চাষযোগ্য জমি, পৌলট্রি ও গবাদিপশুর পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। তবে বাড়ির অবস্থা, ভূমি বহির্ভূত সম্পদ, খাদ্যের নিরাপত্তা, বিশুদ্ধ পানিয় জলের উৎস, মূলধনী দ্রব্য, উপযুক্ত চিকিৎসা সেবা, বিদ্যুৎ সুবিধা ও মোবাইল ফোনের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে যা ঋণ গ্রহীতাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নকে নির্দেশ করছে। ঋণ গ্রহণের পর ঋণগ্রহীতাদের সামগ্রিক ঋণ বদ্ধতা, অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে উচ্চ সুদে ঋণ গ্রহণ এবং বাচ্চাদের স্কুল থেকে ঝরে পরার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বলা যায় ক্ষুদ্রঋণ দরিদ্র ঋণগ্রহীতাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের কিছু নির্দেশকের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেললেও সামগ্রিক ভাবে পল্লী এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচন ও দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণ যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারছেনা।

পঞ্চম অধ্যায়

৫. সুপারিশমালা

পল্লী এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচন ও দরিদ্রদেরদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিম্নলিখিত সুপারিশ সমূহ প্রস্তাব করা হলো।

১) ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো যদিও গ্রামীণ মহাজনদের চেয়ে কম সুদের হারে দরিদ্রদের ঋণ প্রদান করে থাকে তবুও তাদের সুদের হারটা ব্যাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সুদের হারের চেয়ে বেশী। ক্ষদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের সুদেও হারটা কমিয়ে সহণীয় পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে যাতে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে দরিদ্র ঋণগ্রহীতাদের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি না হয়।

২০ ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ঋণটা সঠিক ব্যক্তির হাতে পৌছায় এবং সঠিক কাজে কার্যকর ভাবে ব্যবহৃত হয়। অনেক গ্রাহকই ঋণের টাকা অনুৎপাদনশীলখাতে

ব্যয় করে এমনকি কিছু ঋণগ্রহীতা ঋণের টাকা দিয়ে সুদের ব্যবসা পরিচালনা করে ।

৩) এই গবেষণায় ঋণের আকার ও ঋনগ্রহীতাদের আয়স্তরের মধ্যে ধনাত্মক সম্পর্ক পাওয়া গেছে তাই ঋণগ্রহীতাদের চাহিদা অনুযায়ী ঋণের আকার ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা উচিৎ যাতে তারা আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধমে যথেষ্ট পরিমাণ আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয় ।

৪) বর্তমানে অনেক ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান দ্রুততার সাথে তাদের ক্ষুদ্রঋণকার্যক্রম সম্প্রসারিত করছে এবং মানুষ একই সাথে একাধিক ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করছে । এতে ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর আদায়ের হার কমে আসার সম্ভাবনা থাকে । একই এলাকায় কার্যরত ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজেদের মধ্যে তথ্য আদান প্রদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে কোন ব্যক্তি একটি ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেয়া অবস্থায় অন্যকোন ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে নতুন করে ঋণ নিতে না পারে ।

৫) ঋণগ্রহীতারা যাতে ঋণের টাকা কার্যকরভাবে আয়-সৃষ্টিকারী কর্মকান্ডে বিনিয়োগ করতে পারে সেজন্য তাদের যথেষ্ট পরিমাণ সময় দেয়া উচিৎ । ঋণগ্রহণের ৬ মাস পর থেকে যদি কিস্তি আদায় শুরু করা হয় এবং এক মাস বা ছয় মাস অন্তর ঋণের কিস্তি আদায় করা হয় তাহলে ঋণগ্রহীতাদের পক্ষে কিস্তি পরিশোধ করা সহজ হবে ।

৬) দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য মানব সম্পদের উন্নয়ন আবশ্যক । দরিদ্রদের উপযুক্ত কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলে তারা দক্ষতার সাথে আয় সৃষ্টিকারী কর্মকান্ড পরিচালনা করতে সক্ষম হবে । এজন্য ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রত্যেকটি শাখায় ঋণগ্রহীতাদের জন্য নিয়মিত কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে ।

৭) ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো নগদ অর্থের পরিবর্তে মূলধনী দ্রব্যের আকারে ঋণ প্রদান করতে পারে । এতে ঋণের টাকার অপচয় কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে

৮) ঋণের কাম্য ব্যবহারের জন্য ২০-৩০ বছর বয়সের শিক্ষিত নারী ও পুরুষদের আরো বেশী করে ঋণ কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসতে হবে ।

৬. *উপসংহার*

আমরা এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল থেকে নিম্নলিখিত উপসংহার টানতে পারি ।

১. প্রাথমিক ভাবে হয়তো দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য নিয়েই ক্ষুদ্রঋণের ধারণাটির উদ্ভব হলেও বর্তমানে আমরা ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর যে কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করছি তাতে সহজেই অনুধাবিত হয় যে দারিদ্র্য বিমোচন নয় বরং দরিদ্রদের নিয়ে ব্যবসা করাই এই কার্যক্রমের বর্তমান উদ্দেশ্য । এই ব্যবসা থেকে যে লাভ হচ্ছে তার কিছু উচ্ছিষ্ট অংশ দ্বারা তারা কিছু লোক